দেশ বিভাজনের প্রতিবেদন : খুশবন্ত সিং ও দেবেশ রায়

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ: কেবল সময়ের ইতিহাসিক বয়ান হিসেবে নয়, দেশভাগের সাহিত্য বা 'পার্টিশন-লিটারেচারে'র গুরুত্ব মূলত সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রমুখী জীবনানুসন্ধানের বিস্তারে। পাঞ্জাবি সাহিত্যিক খুশবন্ত সিং ও বাঙালি সাহিত্যিক দেবেশ রায় দুজনেরই অন্যতম পেশা ছিল সাংবাদিকতা। তবে দেশভাগকেন্দ্রিক বিষয়-সংলগ্নতায় রচিত *ট্রেন টু পাকিস্তান* ও *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* উপন্যাসদ্বয় 'লিটেরেরি জার্নালিজম' নয়। দুজনের 'ন্যারেটোলজি' ভিন্ন, তাঁদের শৈলীও স্বতন্ত্র। উদ্বাসন ছাড়াও এ দুই কথাসাহিত্যিকের উপন্যাস সমকালীন রাজনীতি, উপনিবেশায়ন, দাঙ্গা-সাম্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতা, সমষ্টিজীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জিজ্ঞাসায় পূর্ণ। এ প্রবন্ধটি দুই কথাসাহিত্যিকের তুলনামূলক আলোচনা নয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দুই শিল্পীর অভিজ্ঞান কী করে দেশভাগের আখ্যানে রূপ নিয়েছে, হয়ে উঠেছে ইতিহাস-সম 'টেক্সট', এ পর্যায়ে তা-ই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যভুবনে দেশভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ও রূপান্তরের বহুমাত্রিকতা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। ফলে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেশভাগ এবং এর প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যের পরিধি জুড়ে বহমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নিজের প্রয়োজনে 'পার্টিশন' করে — তার অন্যতম চিহ্ন ধারণ করে আছে ভারতভাগের ইতিহাস। এ কথা স্বীকৃত সত্য যে, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ কিংবা বঙ্গভঙ্গ রদ — মূলত ছিল শোষণকর্তা ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সুবিধাজনিত। 'সেইসাথে প্রতিটি বিভাজনে ইংরেজরা সেই নির্দিষ্ট স্থানের সচেতন জনমতকে ভেঙে দিতে পেরেছেন ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্ভাব্য ঐক্যকে ভেঙে দিয়েছেন এই সব বিভাজনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্বার্থের ঐক্যে।' (দেবেশ, ২০১৪: ৪৮)

হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে দেশভাগের সাহিত্য। সাহিত্যে দেশভাগকে উপজীব্য করেছেন এরকম বাঙালি ও অবাঙালি লেখকের একটি দীর্ঘ তালিকা করা সম্ভব। বাংলা ও পাঞ্জাব মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষের আগমন ও ১ কোটি ৭৯ লক্ষ মানুষের নির্গমন ঘটে ১৯৪৭-এর পরবর্তী চার বছরে।[১] রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩), সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫), আতিয়া হোসেন (১৯১৩-১৯৯৮), কৃষণ চন্দর (১৯১৪-১৯৭৭), ভীষ্ম

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.4

সাহনী (১৯১৫-২০০৩), ইনতিজার হুসাইন (১৯২৫-২০১৬), কমলা ভাসিন (১৯৪৬-২০২১), রিতু মেনন (জ. ১৯৪৯), উর্বশী বুটালিয়া (জ. ১৯৫২), আয়েশা জালাল (জ. ১৯৫৬) প্রমুখের রচনায় দেশভাগ, সমকালীন রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের নানামাত্রিক চিত্র ও বিশ্লেষণ আছে। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবৃত্তও রচনা করেছেন অনেকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত:

> এই দেশবিভাজনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের বহু স্তর আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ-বিশ্লেষণের সঙ্গে সেইসব ঘটনাপ্রবাহ বহুবিধ তথ্যের পরেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, দেশভাগের কোনও সামাজিক ইতিহাস নেই। স্মৃতি, সাহিত্য, বর্ণনীয় আখ্যান এসবেই রয়ে যাচ্ছে সেই সামাজিক ইতিহাসের কাড়া-আকাড়া বাস্তব। (মননকুমার, ২০১৪ : ১৩)

দেশভাগ বলতে সাধারণভাবে পাঞ্জাব ও বাংলা দুই প্রান্তের বিভাজন এবং উদ্বাস তথা স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। বাংলা কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক সব শিল্পমাধ্যমই দেশভাগের প্রসঙ্গ ধারণ করে আছে। জীবনানন্দ দাশের *জলপাইহাটি*, অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড*, *নির্বাস*, আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ি*, জ্যোতির্ময়ী দেবীর *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*, গৌরকিশোর ঘোষের *প্রেম নেই*, প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকো*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম*, *অর্জুন*, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *জীবন রহস্য*, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *পারাপার*, শঙ্খ ঘোষের *সুপুরি বনের সারি*, আবুল ফজলের *রাঙ্গাপ্রভাত*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি*, শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক*, সরদার জয়েনউদ্দীনের *অনেক সূর্যের আশা* ইত্যাদি উপন্যাসে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অসীম রায়, মহাশ্বেতা দেবী, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখের গল্পে আছে দেশভাগ ও দাঙ্গার নানাবিধ চিত্র। বাংলা কবিতাতেও আছে এ প্রসঙ্গ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনীতি, দেশবিভাজন ও ধর্মীয় আদর্শের অশুভ টানাপড়েনের ইতিহাস চিত্রায়ণে ও সাহিত্যিকের নিজস্ব অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতার মূল্যান্বেষণ হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ ।

ক.

দেশভাগের গল্প নিয়ে লেখক-সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের (১৯১৫-২০১৪) *ট্রেন টু পাকিস্তান* (*Train to Pakistan*) উপন্যাসটি বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে রচিত। ১৯৪৭ সালে একদিকে বাংলা অন্যদিকে পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে দুটো অংশ যুক্ত হয় ভারত আর পাকিস্তানের সঙ্গে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ উপন্যাসের

বিষয়বস্তু নয়। পাঞ্জাবের হাদালিতে খুশবন্ত সিংয়ের জন্ম, তিনি নিজে একসময় ছিলেন পাকিস্তানের অধিবাসী; দেশভাগের বিপর্যস্ত দিনগুলোতে তিনি তাঁর পরিবারের অন্যদের সাথে ভারতে চলে যান। *ট্রেন টু পাকিস্তান* উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এক প্রান্তিক গ্রাম 'মানো মাজরা'র দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্রে, যে গ্রামে রয়েছে শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বিঘ্ন সহাবস্থান। অচঞ্চল, স্থির এ গ্রামে কেবল দিল্লি থেকে আসা একটা মালবাহী ও একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন কিছুটা প্রাণের স্পন্দন তৈরি করে। শিখ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের গৃহস্থালির মতোই নিয়মমাফিক ও সাধারণ ধর্মচর্চার নিদর্শন রূপে দাঁড়িয়ে আছে একটা মসজিদ ও মন্দির। শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহের সে বর্ণনাও যেন হয়ে ওঠে নিরুপদ্রব। সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় ট্রেনের আগমন-নির্গমনের সাথে সাথে মানো মাজরার জীবন ও সময়ের নিত্য বহমান গতিপথ পেয়েছে প্রতীকী রূপ:

> সকাল সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেন দিল্লী থেকে এলে মানো মাজরায় প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। এটা নিত্য দিনের ঘটনা। এরপর পুরুষরা মাঠের কাজে এবং মেয়েরা বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।...
>
> দুপুরে এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যাওয়ার পর মানো মাজরা বিশ্রামের জন্য তৈরি হয়। পুরুষ ও শিশুরা বাড়ি ফিরে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে ঘুমিয়ে পড়ে।... মহিলারা পরস্পরের চুলে তেল মাখায়, তাদের ছেলে মেয়েদের মাথা থেকে উকুন বাছে এবং গল্প করে। তাদের গল্পের মধ্যে জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুই বেশি সময় জুড়ে থাকে।
>
> সন্ধ্যার সময় লাহোর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসার পর সবাই আবার কাজ শুরু করে।... মেয়েরা রান্না করে রাতের খাবার।... খাটিয়ার ওপর বসে তারা চাপাতি ও সবজি দিয়ে রাতের খাবার খায় এবং পিতলের বড় গ্লাসে করে সরপড়া গাঢ় দুধ পান করে।... মসজিদের ইমাম বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান নামাজ পড়ার।... ঘুমে আচ্ছন্ন বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলার অর্ধবৃত্ত সমাবেশে শিখ-ধর্মযাজক সন্ধ্যায় প্রার্থনার মন্ত্র পাঠ করেন। কিকার গাছের ওপর কাক ডাকে নরম স্বরে। ছোট ছোট বাদুড় সন্ধ্যার আঁধারে সব কিছু নিরীক্ষণ করে। (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ৪-৫)

উদ্ধৃত অংশের বর্ণনায় অপরিবর্তিত জীবনের কোনো ব্যত্যয় ছিল না, অন্তত 'উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।' (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ৫) গ্রামের মাতব্বর বাড়িতে ডাকাতি ও খুনের ঘটনা উপন্যাসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মানো মাজরার ডাকাত আলম সিংয়ের পুত্র জুগ্গাত্ সিং এ ডাকাতির ঘটনায় ফেঁসে যায়, অথচ সে রাতে জুগ্গাত্ ছিল তার প্রেমিকা ইমাম বখশের মেয়ে নুরানের সাথে। উপন্যাসটির চার উপ-অধ্যায় — 'ডাকাতি' ও 'কলিযুগ', 'মানো মাজরা' ও 'কর্ম'-এর মধ্যে 'ডাকাতি' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে মাতব্বর রামলালের খুন, স্থানীয় প্রশাসন ও মানো মাজরার নির্লিপ্ত বিবরণটি আসলে মানো মাজরার অধিবাসীর ট্রাজিক পরিণতির এক

ভূমিকা। যেখানে ডাকাতি ও খুনের ঘটনা দেশভাগজনিত অস্থিরতারই সূচনা, যদিও গ্রামে বছরে একবার ডাকাতির ঘটনা ঘটে। কিন্তু দেশটা ভারত-পাকিস্তানে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর শুরু হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা — এ রকম খবর উপন্যাসের ভূমিকাতেই দেওয়া হয়েছে। দেশভাগের ভয়াবহতায় প্রতিফলন ছিল উন্মত্ত দাঙ্গার মধ্যে, *ট্রেন টু পাকিস্তান* উপন্যাসে দাঙ্গার বীভৎস নারকীয়তার বর্ণনা রয়েছে শুরুতেই। এ পর্যায়ে ঔপনাসিকের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত ও তথ্যধর্মী বিবরণ দাঙ্গার ভয়াবহতাকে ন্যূনতমও ম্লান করেনি:

> দেশভাগের খবরে কয়েক মাসের মধ্যে এই দাঙ্গার শিকার হল কয়েক হাজার মানুষ। মুসলমানরা বলল, হিন্দুরা পরিকল্পনা মোতাবেক হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে; হিন্দুরা বলল, মুসলমানরাই এজন্য দায়ী। আসল কথা হলো, দু'পক্ষের লোকই দাঙ্গার শিকার।... কোলকাতা থেকে ঐ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল উত্তর, পশ্চিম ও পশ্চিম এলাকার জনপদে। পূর্ব বাংলার নোয়াখালিতে মুসলমানরা খুন করল হিন্দুদের। বিহারে হিন্দুরা খুন করল মুসলমানদের। বিহারে নিহত মুসলমানদের বাক্সভর্তি মাথার খুলি নিয়ে মোল্লারা ঘুরে বেড়াল পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে।... ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার সময় পর্যন্ত এক কোটি লোক — হিন্দু, মুসলমান, শিখ পালিয়ে বেড়ালো। তাদের মধ্যে প্রায় দশ লাখ লোক নিহত হলো। সমগ্র উত্তর ভারত প্রত্যক্ষ করল অস্ত্রের ঝনঝনানি। ভীতির শিকার হলো এক কোটি লোক, তারা পালিয়ে রইল। (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১-২)

জাতীয় রাজনীতি কিংবা এর প্রতিফলন হিসেবে দেশভাগের ব্যাপারে মনো মাজরার নির্দোষ গ্রামবাসীর কোনো অংশীদারিত্ব ছিল না। দেশভাগ-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক দুর্ভোগের দু'রকম চিত্র রয়েছে এ উপন্যাসে। সামষ্টিক মানুষের বাস্তবতাই ব্যক্তিমানুষের বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে সেই দেশভাগজনিত স্বাধীনতা কোনো অর্থ বহন করেনি তখন। কেননা বাস্তুভিটা থেকে উপড়ানো মানুষের ব্যক্তিক স্বাধীনতা, বাঁচবার স্বাধিকার ও ইচ্ছা তখন দারুণভাবে প্রতিহত, বিপর্যস্ত। উপন্যাসে-অঙ্কিত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত গ্রামটির শিখ ও মুসলমানেরা দ্রুত নিজেদের ধর্মীয় শ্রেণির সংজ্ঞার্থে আলাদা করে চিহ্নিত করল একে অপরকে; যারা দীর্ঘ বছর ধরে সহাবস্থান করছিল। কারণ মুসলমানেরা তখন শুনেছে, "মসজিদে শূকর হত্যা করে মসজিদকে অপবিত্র করা হয়েছে, বিধর্মীরা কোরআন শরীফ ছিঁড়ে ফেলেছে। আকস্মিকভাবে মনো মাজরার সব শিখ তাদের কাছে পরিণত হলো অসৎ উদ্দেশ্যের আগন্তুক হিসেবে। ওদের লম্বা চুল ও দাড়ি, হিংস্রতা ও কৃপাণ মুসলিম বিদ্বেষের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হলো। এই প্রথমবার 'পাকিস্তান' নামটি ওদের কাছে নতুন অর্থ নিয়ে এলো।" (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১১২) ওদিকে শিখরাও ছিল মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ও ক্রুদ্ধ। 'সর্বশেষ গুরু ওদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে মুসলমানদের কোনো স্বদেশপ্রেম নেই।' (খুশবন্ত, ১৯৯৬:

১১৩) শিখ উদ্বাস্তুরা অভিযোগ করেছে যে, 'মুসলমানদের কাছে ইজ্জত বিসর্জন দেয়ার আগে বহু মহিলা কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছে অথবা শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যারা আত্মহত্যা করেনি, তাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় নামানো হয়েছে, জনসমক্ষে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং শেষে হত্যা করা হয়েছে। এখন মুসলমানদের হাতে নিহত ট্রেনভর্তি শিখদের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে মানো মাজরা গ্রামে।' (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১১৩) সেই দুঃসময়কে মানো মাজরার অধিবাসী বলেছে কলিযুগ বা অন্ধকার যুগ। যাত্রীবিহীন, হাজারের অধিক শববাহী ট্রেন একটি শান্ত জনপদের মানুষের জীবনের ছন্দকে তখন ওলটপালট করে দিয়েছে। মৃত্যু, হিংসা-বিদ্বেষও গ্রামকে গ্রাস করে নেয়; দ্রুততম সময়ে মানবতার যে স্খলন ঘটে গিয়েছিল, তার সূক্ষ্ম ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে এ উপন্যাসে। ট্রেনফেরত হাজারো লাশ প্রশাসন কর্তৃক পুড়িয়ে ফেলা এবং শত্রুঘ্ন নদীতে শ'য়ে শ'য়ে লাশ ভাসার খবর আসে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা:

> নদীর পানি আরও বেড়েছে। এর কর্দমাক্ত পানিতে ভেসে যাচ্ছে গরুর গাড়ি, ফুলে-ফেঁপে ওঠা গরুর মৃতদেহ — তখনও গাড়ির সাথে বাঁধা। পুরুষ ও মহিলার মৃতদেহও ভাসছে, কাপড় জড়িয়ে আছে ওদের নিষ্প্রাণ দেহে। ছোট ছোট শিশু শুয়ে আছে পানির ওপর, পানিতে হাত দুটো ভাসছে।
>
> ... ব্রিজের খিলানের দিক থেকে বহু লোকের বিকৃত মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখা গেল। পাহাড়ের ওপর গাছ কেটে তা সমতল ভূমিতে আনার জন্য যেমন নদীতে ভাসমান অবস্থায় আনা হয়, তেমনিভাবে ভেসে আসছে মৃতদেহ মানুষ, পশুর। (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১৩৩)

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার হুকুম চাঁদের অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে ক্রম-মৃত্যু ঠেকাতে না পারার দুঃসহ বিবেকি কাতরতায়:

> 'আমি কী করতে পারি?' কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। 'সারা বিশ্বটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে! যাক পাগল হয়ে! আরও হাজার খানেক লোক খুন হলে কী এসে যায়? একটা বুলডোজার এনে আমরা তাদেরও আগের মতো করে সমাহিত করব। নদীর ধারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমাদের বুলডোজারের দরকার নেই। মৃতদেহগুলো শুধু নদীতে ফেলে দেব। চল্লিশ কোটি লোক থেকে কয়েক শ' চলে গেলে কী আর এমন হবে! মহামারীর সময় তো এর দশগুণ লোক মারা যায়।' (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১৪৪)

সমকালীন বাস্তবতায় প্রশাসনের এ নিঃসহায় সমপর্ণের চিত্র কেবল মানো মাজরার নয়; সমালোচক বলেন:

> Through his portrayal of Hukum Chand, Khushwant Sing shows how the much maligned Indian bureaucracy was itself caught between the hatred of a people and the bungling of politicians. (Saros, 1982: 24)

কোথাও কোথাও পুলিশ বা সেনাসদস্যরাও সাম্প্রদায়িকতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে—উপন্যাসে এর উল্লেখ আছে। দেশভাগের অভিঘাতে এভাবে অবিরাম মৃত্যুর মতো আরেক অভাবনীয় সংকট হলো বাস্তুভিটা ছেড়ে এক দেশহীনতার দিকে অভিযাত্রা। মানো মাজরার মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্যও তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা। তবে গ্রামের মুসলমান তাঁতি ইমাম বখশ আর শিখ সর্দার মিত সিংয়ের কথোপকথনে এটা স্পষ্ট যে, মুসলমানদের প্রতি শিখ গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া প্রথমেই শত্রুসম রূঢ় হয়ে যায়নি। তারা একে অপরকে আশ্রয় দিতে চেয়েছে, কিন্তু দ্রুতই পরিস্থিতি বদলে যায়। জন্মভূমি পরিত্যাগের অমোঘ বেদনা সমানভাবে অনুভব করে শিখ ও মুসলমান গ্রামবাসী:

> পাকিস্তানে গিয়ে আমরা কি করব? আমরা এখানে জন্মেছি। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এখানে জন্মেছেন। তোমাদের সাথে আমরা বসবাস করছি ভাইয়ের মতো। ইমাম বখশ আর বলতে পারলেন না, কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মিত সিং তাঁকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর কণ্ঠও রোধ হয়ে এলো কান্নায়। উপস্থিত অনেকের কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল। অনেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।
>
> সর্দার বললেন, হ্যাঁ তোমরা আমাদের ভাই। আমাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা তোমাদের স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। কিন্তু চাচা, আমরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে। তারা যদি কিছু করে তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে?... আমি শুনেছি যে, কয়েকটি গ্রাম হাজার হাজার উন্মত্ত লোক ঘিরে রেখেছে। তাদের হাতে আছে বন্দুক ও বর্শা। ওদের প্রতিরোধ করার কোনো প্রশ্নই নেই। (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ১১৮)

শিখ ও মুসলমান চাষিরা পরস্পরকে জড়িয়ে শিশুর মতো কেঁদে শেষ পর্যন্ত জীবনের এ অকস্মাৎ পরিণতিকে অসহায় স্বীকৃতি দেয়। আর মুসলমান গ্রামবাসী সকলে প্রস্তুতি নেয় পাকিস্তান-অভিমুখী ট্রেনে অনিশ্চিত যাত্রার। কিন্তু মানো মাজরা গ্রাম থেকে ট্রেনভর্তি মুসলমান উদ্বাস্তুদের রাতের আঁধারে খুন করে পাকিস্তানে পাঠাবার পরিকল্পনা হলে গ্রামের বদমাস খ্যাত জুগ্গাত্ সিং অবতীর্ণ হলো ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। রাতের আঁধারে যাত্রীবাহী ট্রেনকে আটকে সবাইকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল দাঙ্গাকারীরা। উপন্যাসের পরিণতিতে জুগ্গাত্ সিং নিজের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানগামী ট্রেনের যাত্রীদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল; যে ট্রেনে ছিল তার প্রেমিকা গর্ভবতী নুরানও। দাঙ্গাকারীরা গুলি করে মারে জুগ্গাত্ সিংকে। তার গভীর সাহসিক ও চূড়ান্ত আত্মত্যাগের চিত্রণের মধ্য দিয়ে উচ্চতর মানবতার আদর্শের প্রতি ঔপন্যাসিকের নিবিড় আস্থা-বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে।

দেশবিভাগের কিছুকাল পরেই বিবৃত দেশকালের এ আখ্যানে ইতিহাস ও ইতিহাসস্থিত মানুষের দুঃসহ সংকটকে তখন চলমান জীবন-সংকটের আবর্তে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও

বিপ্লবের আদর্শ বহন করা ইকবালের দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত হয়েছে উপনিবেশায়িত ভারতবর্ষের অমীমাংসিত স্বাধীনতার রূপ, জিজ্ঞাসিত হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সামাজিক চর্চায় ধর্মচর্চার প্রসঙ্গ। মানো মাজরার শিখ ও মুসলমান বা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে ইকবাল আত্মসংকটে পড়ে, তার চর্চিত রাজনেতিক মতাদর্শ ও বিপ্লব ভাবনা অসার মনে হতে থাকে তার কাছে:

> ভারতের মতো বিশাল দেশে এবং অগণিত মানুষের মাঝে তাঁর মতো ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি কতটুকুই বা করতে পারেন? তিনি কি হত্যা বন্ধ করতে পারবেন? হিন্দু, মুসলমান, শিখ, কংগ্রেস কর্মী, লীগ কর্মী, আকালী বা কমিউনিস্ট দল — সবাই এ কাজে জড়িত। বুর্জোয়া বিপ্লব প্রোলেতারিয়েত বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে এমন কথা বলা আত্মতুষ্টিরই নামান্তর। ঐ অবস্থা এখন আসেনি। হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের সাধারণ লোক এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে উদাসীন। ভিন্নধর্মী লোককে খুন করে তার জমি আত্মসাৎ করাকে তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মনে করে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে খুন করে সম্পত্তি আহরণের প্রবণতাকে দূর করে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐ সংগ্রাম পরিচালনা করা যেতে পারে। এটাই সাধারণ শ্রেণীর লোকের সংগ্রামের সহজ পথ। তাঁর দলীয় লোকেরা এ কথাটা বুঝতে পারেন না। (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ৪৭)

এ উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে ধর্মের অন্তঃসারশূন্য চর্চাও; উপেক্ষিত মানবিক আদর্শ ও নিদারুণ অভিঘাতই অনুভূত হয়েছে অনেক বেশি; বিধৃত হয়েছে প্রতিশোধপরায়ণতা আর জিঘাংসার রূপ। ধর্মীয় পরিচয় অমীমাংসিত থাকে বলে কমরেড ইকবাল গন্তব্যহীন অনুভবে ভোগে; অথচ সে সবসময় বলতে অভ্যস্ত ছিল 'আমার কোনো ধর্ম নেই।' দেশভাগের চরম সংকটময় সে মুহূর্তে ইকবাল অনুভব করে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক এক সত্য:

> লিঙ্গের অগ্রবর্তী চামড়ার অংশ কাটা হয়েছে কি হয় নি তার ওপর একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোথাও মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে? এটা দুর্ভাগ্যজনক না হলেও হাস্যকর তো বটে! (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ২৫২)

গ্রামের শিখ সরদার বানতা সিং ইকবালের সাথে কথোপকথনে দেশবিভাজনের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছিল, 'স্বাধীনতা নিশ্চয়ই একটা ভালো জিনিস। কিন্তু এর থেকে আমরা কি পাচ্ছি? আপনাদের মতো যারা শিক্ষিত লোক অর্থাৎ বাবু সাহেব তারা চাকরি পাবেন, যা ইংরেজরা করত। কিন্তু আমরা, আমরা কি বেশি জমি বা মহিষ পাব?' (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ৪৫) সরদার সাহেব আরও যোগ করেন, 'সারা দেশে ধ্বংসের বাতাস বইছে। আমরা যা শুনছি তা শুধু হত্যা হত্যা আর হত্যা। স্বাধীনতা ভোগ করছে কেবল চোর, ডাকাত ও হত্যাকারীরা। আমরা ব্রিটিশদের অধীনে বেশ ভালো ছিলাম। অন্ততপক্ষে সে সময় নিরাপত্তা ছিল।' (খুশবন্ত, ১৯৯৬: ৪৬) ভারতবর্ষের সেই বিপুল সংকটের দিনে ইকবালের

ইউরোপীয় জ্ঞান একেবারে অকার্যকর — এ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গটি করতে ঔপন্যাসিক ভোলেন না। ফলে ট্রেনভর্তি মুসলমানকে হত্যা করার পরিকল্পনা মিত সিংয়ের কাছে জেনেও কিছুই করতে পারে না সে, পরিণামে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। কারণ তার কোনো আদর্শিক বয়ানই উন্মত্ত মানুষের জিঘাংসাকে থামাতে সক্ষম ছিল না আর। বিপরীতে অশিক্ষিত, গোঁয়ার মূর্খ ডাকাত জুগ্গাত্ সিং জীবনের বিনিময়ে যাত্রীবাহী ট্রেনটিকে বাঁচিয়ে হয়ে ওঠে উচ্চতর মানবিকতার প্রতিভূ। খুশবন্ত সিং তাঁর এ ঐতিহাসিক কথকতায় উদ্বাস্তু মানুষের অভিজ্ঞতাকে গভীর গুরুত্ব দিয়েছেন।

খ.

২০১০ সালে প্রকাশিত হয় দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) হাজারোর্ধ্ব পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। নিকট ইতিহাসকে অবলম্বন করে লেখা এ উপন্যাসের কালপর্ব মোটামুটিভাবে ভারত-স্বাধীনতার আগের কয়েকটি দশক। উক্ত সময়পর্ব একদিকে যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি নানা বিতর্কের আধার।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময়পর্বে যোগেন মণ্ডল ছিলেন দুই বাংলার রাজনীতির অন্যতম আলোচ্য ও প্রভাবসঞ্চারকারী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতি বা ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনায় তিনি ক্রমশ এক বিস্মৃত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। প্রবল প্রভাব থেকে প্রায় বিস্মৃতির কারণ এ মহাআখ্যানে খুঁজতে চেয়েছেন দেবেশ রায়। যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, দর্শন যা একসময়ে প্রবল সাড়া ফেলেছিল — এ উপন্যাসে তা বিস্তারিত রয়েছে। দেবেশ রায় গোটা আখ্যান জুড়ে অনুপুঙ্খ বিস্তারে দেখিয়েছেন যোগেন মণ্ডল বরিশালের মাটি থেকে উঠে এসে কীভাবে গোটা উপমহাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছেন; বিশেষত বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন কীভাবে তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। একই সাথে দেশভাগের সময়ে যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান যাত্রার নির্মম ইতিবৃত্তও পরিস্ফুট হয় ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণে।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে সদস্যগণ বাংলা বিভাজনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এরূপ বিভাগের বিপক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদ সভা করেন। তিনি মুসলিম লিগের সংসদীয় বোর্ডের সদস্যও হন। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর যোগেন্দ্রনাথ পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার আইন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের করাচিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মণ্ডল মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় সংঘটিত ধ্বংসাত্মক দাঙ্গার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মণ্ডল সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছ

থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে যেরূপ গুরুত্ব পেতেন সেরূপ আর পাননি। তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে পালিয়ে কলকাতায় আসেন ও ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একজন সাংবাদিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ১৯৪৩ সাল থেকে *জাগরণ* নামে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালের বিভাগের পর এ পত্রিকার অফিস ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৬৮ সালের ৫ অক্টোবর কলকাতায় মারা যান। দেবেশ রায় ইতিহাসের এ যোগেন মণ্ডলকে নিয়ে লিখলেন তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। বিশটি অধ্যায়, ১৮১টি উপশিরোনামসমৃদ্ধ এ বিস্তৃত আখ্যানে রয়েছে যোগেন মণ্ডলের দীর্ঘ জীবনবার্তা ও উপনিবেশিত ভারতের চিত্র। বিশেষত ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ভারতের বিচিত্র রাজনৈতিক ও সম্পৃক্ত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বিধৃত আছে এতে। অধ্যায় বিন্যাসের শুরুতে লেখক বলেছেন:

> যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত এখন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই দশটি বছরে তিনি ছিলেন বাংলার নমশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে পরে তিনি প্রধানতম বিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩-এ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন। ৪৬-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে সারওয়ারদির মন্ত্রিসভাতেও। ১৯৪৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতেরই শত্রু হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় চলে আসেন। আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডল তাদের শূদ্রতার কারণে কোনো জাতীয়তাবাদেই গৃহীত হন নি। কিন্তু বহু নিন্দা ও বিরোধিতার পর কংগ্রেস দলিত-ভোটের জন্য আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমণ্ডলিতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স-ম্-পূ-র্ণ মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না। (দেবেশ, ২০১০: অধ্যায়সূচি)

ইতিহাস-উপেক্ষিত এ নেতা তথা সংস্কারককে দেবেশ রায় তাঁর বিনির্মিত দীর্ঘ ইতিহাসে ফিরিয়ে আনলেন। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* উপন্যাসটি গোটা ভারতবর্ষে ব্যক্তিমানুষের সহাবস্থান তথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের পাশাপাশি তফশিলি সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ইতিবৃত্তও বটে। এ প্রসঙ্গে সমাজে ও রাজনীতিতে প্রকট হয়েছে এলিট-নন-এলিট দ্বন্দ্ব। সামগ্রিকভাবে দরিদ্র, শিক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদপদ এ নমঃশূদ্রের শোচনীয় পরিণতি হলো — তারা বর্ণহিন্দুর জাত-পাত বোধের শিকার। প্রজন্ম পরম্পরায় অর্জিত ও মনস্ক প্রশিক্ষণে নমঃশূদ্র জেনে যায় তার নাম বা পদবীও থাকতে নেই; থাকতে নেই নিজস্ব জমি কিংবা ঘরও।

বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তফশিলিদের (Scheduled Caste)[২] নির্দিষ্ট অবস্থান বজায় রাখতে গিয়েই মূলত যোগেনের রাজনীতি, সংগ্রাম। যোগেন মণ্ডল বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তফশিলিদের নির্দিষ্ট অবস্থান সবসময় বজায় রাখতে চেয়েছেন। যোগেনের স্পষ্ট ব্যক্তব্য ছিল, 'এই দেশ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়নি, তফশিলিদের আলাদা অবস্থান রযেছে এবং তারা হিন্দুসমাজের অংশ নন।' (দেবেশ, ২০১০: ৩১৯) তাছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার রাজনীতিতেও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের রক্ষা করা শূদ্রদের কাজ নয় ও মুসলমানদের সঙ্গে শূদ্রদের শ্রেণিগত মিল অনেক বেশি। এভাবেই নমশূদ্র হিসেবেই পৃথক এক রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছেন যোগেন মণ্ডল। এসূত্রে তিনি অন্বেষণ করেছেন 'অহিন্দু ভারতীয়তার ভিৎ' (দেবেশ, ২০১০: ৫০৮)। তবে যোগেন মণ্ডলের এ ইতিহাস-পরিক্রমা তথা রাজনৈতিক জীবন সহজ ছিল না। দেবেশ রায় তাঁকে যুদ্ধসৈনিকই আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভেতরে সব রাজনৈতিক-সামাজিক কিংবা ধর্মীয় প্রশ্নই উত্থাপিত হয় — তাঁর শূদ্র অস্তিত্ব থেকে। অথচ তাঁর তীব্র রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় তখনই যখন তিনি ভেবে ফেলতে পারেন যে, তাঁকে বর্ণহিন্দুর মতো শিক্ষিত ও সফল হতে হয় বর্ণভেদের বিরুদ্ধতা করার অধিকার অর্জনের জন্য! 'একটা কি ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে না সেই মানুষটি যে শূদ্র অথচ বর্ণহিন্দুর সমতুল্য নয়।' (দেবেশ, ২০১০: ৪৭৩) এভাবে সংকট সাথে করেই যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। ইতিহাসজ্ঞান থেকেই তিনি জানতেন, ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনকেও নিজের পক্ষপুটে নিয়ে আসার কী আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে ব্রাহ্মণ্যবাদ। যোগেন মণ্ডলের সংকট বা দ্বন্দ্ব ছিল বহুমাত্রিক — নমঃশূদ্র হিসেবে, বর্ণবাদী 'এলিট' হিন্দুর সাথে নব্য রাজনীতিক হিসেবে, নিজ জাতির সংগ্রামে, দেশভাগ পূর্ব ও সংলগ্ন দ্বান্দ্বিক রাজনীতি-উদ্ভূত সংকীর্ণ পরিবেশে। যোগেন মণ্ডলের ভারতবর্ষ-অনুসন্ধানী ধ্যান এবং অপর দেশযাত্রায় এ মহাকাব্যোপম উপন্যাসের সমাপ্তি হলেও সেটি তার জীবন ও অস্তিত্বের ব্যাপ্ত সংগ্রামের অসমাপ্ত অন্বেষণকেই ব্যাখ্যা করে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-উদ্ভূত দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে যোগেন মণ্ডলের তীব্র অবস্থান দেখি। '৪৬-এর আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গায় সময় 'শিডিউল কাস্ট'কে যোগেন মণ্ডল এ দাঙ্গা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তফসিল নেতা রসিকলালের বয়ানে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় দাঙ্গার সংজ্ঞার্থ দেন; তথ্যসহ ব্যাখ্যা করেন '৪৬-এর দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম-শিডিউল কাস্টের পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থান:

> দাঙ্গা মানেই তো মারার স্বাধীনতা। যখন বাঁচার স্বাধীনতা থাকে না আর আর-একজনকে মারার স্বাধীনতাই মাত্র থাকে — তখনই সেই অবস্থাকে দাঙ্গা বলে। আমাদের দেশে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। (দেবেশ, ২০১০: ৮৯৪)

এ প্রতিপক্ষ মনোভাবই ভারত-বিভাজনের মূল কারণ। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংঘটিত অসংখ্য দাঙ্গার কারণ কেবল ব্রিটিশরাজের প্ররোচনা নয়, দায়ী সমকালীন রাজনীতিও। যোগেন বোঝেন যে হিন্দুদের সামাজিক সংগঠনগুলো ও মুসলমানদের রাজনৈতিক পার্টি ছাড়া কোনো দাঙ্গা হতেই পারে না। কিন্তু এর চেয়ে বড় অনুভূত সত্য হলো — 'হিন্দু বড়জাতের কাছে তপশিলি বা শূদ্র আর মুসলমানরা পৃথক কোনো জনসত্তা নয়। চাঁড়াল আর নেড়া — দুইয়ে মিলে একটাই ছোটলোক।' (দেবেশ, ২০১০: ৮৯৪) দাঙ্গায় তফশিলি মানুষ সম্পর্কে ব্রিটিশরাজ ও কংগ্রেস লিগ নেতাদের প্রতি যোগেনের প্রশ্ন —

> বাংলার দাঙ্গা বললেই তো আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু মুসলমান। পাঞ্জাবের দাঙ্গা বললেই আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু শিখ ও মুসলমানদের দাঙ্গা। কিন্তু বাংলাতেই হোক আর পাঞ্জাবেই হোক, যে দুটি সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, সেই দুটি সম্প্রদায়ের বাইরেও তো অনেক মানুষ থাকেন, যেমন, তপশিলিরা, তাঁরা কী করছেন।
>
> সকলেই ধরে নিয়েছেন, যোগেনের তৃতীয় পক্ষ কাল্পনিক। এতে সবাই এমন হেসে উঠলেন। (কিন্তু) বিহারের দাঙ্গা নিয়ে প্যাটেল (যখন) বললেন, 'গভর্নর নাকি বরাবরই বলছেন, সাহেবরা যেন কোনো ভাবেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় থার্ড পার্টি না হয়ে যায়। তখন কেউ আর হাসে নি।' (দেবেশ, ২০১০: ১০৪৫)

'শিডিউল কাস্ট'কে প্ররোচনা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগে যোগেন মণ্ডল কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভাকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। অবশ্য তাঁর মতামত এবং বক্তব্য তৎকালীন হিন্দু কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়নি (Dwaipayan, 2018: 80)। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, 'ঐ আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য।' (জয়া, ভূমিকা: ৩) সময়ের দুর্বিনীত সত্যকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন নির্মোহ ভঙ্গিমায়:

> ধর্মান্ধগত্য থেকে থেকে জাতিবোধ, জাতিরক্ষণ আর আত্মরক্ষা একার্থক হয়ে যাওয়া, আত্মরক্ষার বাধ্যতা থেকে চণ্ড রিরংসা তৈরি করে তোলা, সেই রিরংসার তৃপ্তি এক তীব্র তুঙ্গ শঙ্কুন ক্ষমতায় পৌঁছে। একমাত্র তেমন ক্ষমতার বশেই বিধর্মী পরিচয়ের কাউকে খুন করে ফেলাটাই নৈতিক মর্যাদা পেয়ে যায়। এটা নিশ্চয়ই দঙ্গল পাকিয়ে একটা স্বপরিচয় লাভের জটিল, গভীর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটে। (দেবেশ, ২০১০: ৮৫২)

ভারতবর্ষে ইতিহাসের এ সংকটতম মূহূর্তকে বিশ্লেষণ করার সূত্রেই ঔপন্যাসিক 'ভারতের জাতীয়তাবাদ' প্রসঙ্গটি সমকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস বা জাতীয় আখ্যান নির্মাণে প্রশ্ন তোলেন, "হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাই কী এক্ষেত্রে সবচেয়ে 'মূল্যবান' উপাদান? আর

তার সঙ্গে জড়িয়েই গান্ধীজী ও জিন্নার রাজনৈতিক সব কাজকর্ম দেখা কি সঙ্গত?" (দেবেশ, ২০১০: ৯২৭) ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> আদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যকার সম্পর্ক জটিল এবং দুই বিপরীতধর্মী শক্তির একটি সংশ্লেষিত রূপ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শিকভাবে সত্যিকার অর্থে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তেমনি তার দার্শনিক ভিত্তিও সুদৃঢ় নয়। (জয়া, ২০০৩: ১)

উপন্যাসে দেবেশ রায়ের জাতীয়তাবাদের অনুসন্ধানেও এ সত্য গভীরভাবে অনুভূত হয়। এছাড়া জাতীয়তার দার্শনিক রূপ অন্বেষণে তিনি 'উত্তর-উপনিবেশবাদী' দৃষ্টিতে বিবেচ্য ইংরেজ সংসর্গে পাওয়া 'নেশনে'র মহত্ত্বও এড়িয়ে যেতে পারেন না বলে সূক্ষ্ম আক্ষেপ করেন। কারণ কলোনি-অস্তিত্বও আমাদের জাতীয় আখ্যানের অন্তর্গত। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদের ধারণাটি একরকম নিষ্পত্তিহীন থাকে মূলত হিন্দু-মুসলিম শ্রেণিদ্বন্দ্বে, 'জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় তাই সাম্প্রদায়িকতা সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। আবার সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি হওয়ার ভয়ও থেকে যায়।' (দেবেশ, ২০১০: ৯২৯)

বাংলা ভাগ তথা দেশভাগের পরিকল্পনাটি যোগেনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞাসিত হয়েছে উপন্যাসে এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে নিষ্পত্তিহীন এক জাতীয়তাবাদী ধারণার বিতর্কে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ', 'ক্রিপস্ মিশন', 'ভারত ছাড়ো', 'দিল্লী চলো' প্রভৃতি ঘোষণায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দিশেহারা বোধ করতে থাকে যোগেন। 'তার দিশে আরো হারিয়ে গেল বাংলার রাজনীতির অস্থিরতায়। ১৯৪২ সালেও বাংলায় যাদের কিছু-না-কিছু-সংগঠন ও কর্মী আছে তাদের কেউ এই তিনটি প্রস্তাব নিয়ে একটি কথাও বলেনি।' (দেবেশ, ২০১০: ৯৫৭) ইতিহাসে উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ভাগ করার মতো একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রয়োজনে সারা বাংলায় গণভোট অনুষ্ঠানের আবেদন জানান যোগেন । তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'বর্ণহিন্দুগণ যে আটটি জেলা নিয়ে একটি হিন্দু প্রদেশ (পশ্চিম বাংলা) গঠন করতে চাইছেন সেখানেও শতকরা ৩৮ জনই তফসিলি সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন।' (উদ্ধৃত, মান্নান, ২০০৭: ২৬৬) ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন:

> বাংলার অধিকাংশ অমুসলমান বাংলা ভাগ সমর্থন করে না। বাংলার দাঙ্গা একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র বরং তা সর্বতোভাবেই পরিকল্পিত। এই অজুহাতে বাংলা ভাগ করা অবিবেচকের কাজ হবে। দাঙ্গা কখনোই সমস্যার সমাধান হিসাবে গণ্য হতে পারে না। (উদ্ধৃত, মান্নান, ২০০৭: ২৬৬)

ভারত স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব এবং কেন্দ্র তথা দিল্লীর নেতাদের সাথে ব্রিটিশ-পক্ষের আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে যোগেন জানতে চান: "দাদা, এই যে দিল্লিতে এত লেনদেন হচ্ছে, একটু বুঝায়্যা দেন-না।

কিরণশঙ্কর খুব হেসে বলেছিলেন, 'যোগেনবাবু, আমি বুঝলে তো আপনাকে বলব?" (দেবেশ, ২০১০: ৯৫৭) যোগেন ক্রিপস্ প্রস্তাব ও বাংলার নেতাদের সাথে কেন্দ্রের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে বলেন: 'খুব পরিষ্কার না থাইকলেও ভাগাভাগির একটা কথা কিন্তু উইঠ্যা পইড়ছে। হাওয়াডা যে উইঠল, তাতে বারবারই কয়েকডা জায়গার নামই ঘুর্‌যাফিরা উইঠল — পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বাংলা আর বাংলার সঙ্গে মিশ্যাইয়া দুই-একবার আসাম। তো বাংলার একডা নেতার সঙ্গে কোনো কথা হইল ন্যা? বাংলার যে-পার্টিরই হোক, একটা মতামত তো নিব?' (দেবেশ, ২০১০: ৯৫৮) বাংলা বিভাজন প্রসঙ্গে দীর্ঘ এ উপন্যাসে বিশ্লেষিত হয়েছে অবিভক্ত বাংলার দ্বন্দ্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিশেষত '৪২ থেকে '৪৭-এর মধ্যে যুদ্ধসময় ও তার বিভীষকায় কিংবা যুদ্ধ-আক্রান্ত দুর্ভিক্ষের করালরূপ (যা গণহত্যার শামিল) এবং অন্যদিকে ঘনায়মান গণবিক্ষোভ ('ভারত ছাড়ো' ও দাঙ্গা পরিস্থিতি) প্রভৃতি সংঘটনায় বাংলা ক্রমেই বৃত্তকেন্দ্র থেকে চ্যুত হতে থাকে। ঔপন্যাসিক যার নাম দিলেন 'খরচের খাতায় বাংলা' (অধ্যায় : ১৭১, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*)।

ক্রমে এক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই সমকালীন রাজনীতি-কর্তাদের বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মতো সংকীর্ণ দাবির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীও আরেকটি বিবৃতিতে 'বঙ্গভঙ্গে'র দাবি জানান। তিনি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের প্রশ্নে হিন্দু মহাসভার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। প্রাসঙ্গিক যে, ১৯৪২ এর মধ্যেই বাঙালির সমাজ শরীরে দুটি দেহ — (১) 'স্বাধিকার বঞ্চিত' হিন্দুসমাজ, (২) 'অধিকার অর্জন প্রয়াসী' (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল সেই অধিকার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা) মুসলমানসমাজ। সাতচল্লিশের পার্টিশনে বাংলা ভাগ ছিল অনিবার্য। এ সম্পর্কে দেবেশ রায়ের মূল্যায়ন:

> ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি আলাদা গুচ্ছে ভাগ করার ও সেই ভাগের ভিত্তিতে যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে কথা-বলার ক্রিপস প্রস্তাব বাতিল হল তামাদি হুন্ডি বলে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে তিনটি গুচ্ছে যে সাজানো হয়েছিল সেটা থেকেই গেল। ক্যাবিনেট মিশন ফিরে যাওয়ার পর ওয়াভেল 'ইনটেরিম গভর্নমেন্ট' শব্দটি — ব্যবহার করলেন ভাইসরয়ের 'একজিকিউটিভ কাউন্সিলে'র বদলে।... ব্রিটেন যাকে বলে ক্ষমতা-হস্তান্তর, ভারতীয়রা যাকে বলে স্বাধীনতা, পাকিস্তানি যাকে বলে পার্টিশন— সেই ঘটনা ঘটল ১৪-১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। (দেবেশ, ২০১০: ১০৩৮)

দেশভাগের এ অনিবার্য পরিণতিতে 'অস্পৃশ্য' যোগেন মণ্ডল তার রাজনৈতিক আদর্শ, শূদ্র-অস্তিত্বের আজীবন সংগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে এক নিঃসঙ্গ রাজনৈতিক

নেতা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হলো। শূদ্র হিসেবে যোগেন তাঁর 'স্বজাতির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছিলেন, তিনিই শেষ জীবনে রাজনৈতিক অস্পৃশ্য হয়ে গেলেন, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঐতিহাসিক রহস্য আর কী হতে পারে?' (পার্থ, ১৪২১: ৬৩) ঔপন্যাসিকের আক্ষেপ, 'যোগেন যে-শূদ্রদের নেতা ছিল, সেই শূদ্রতা হয়ে গেল একাডেমিক পলিটিক্যাল বিষয়।' (দেবেশ, ২০১০: ১০৫১)। তাছাড়া, কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সারা ভারতে এতটা অপমানিত হতে হয়নি, এতটা ঘৃণিত হতে হয়নি, এতটা তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়নি।

এ উপন্যাসের সমাপ্তি ১৯৪৭-এর দেশভাগের এক নাটকীয় মুহূর্তে। পৃথক সীমারেখাসহ একটা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সেই ক্ষণে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ভেতরকার দ্বন্দ্বময় শ্রেণি-সংগ্রাম, অখণ্ড দেশে বসবাসরত মানুষের বৈচিত্র্যময় সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ভেতর ঢুকে যাওয়া অলঙ্ঘ্য বিশ্বাস-সংস্কার; বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার বোধ ও তা নিয়ে বিপুল রাজনীতিকরণ, সাম্রাজ্যবাদিতার কৌশল-প্রতিঘাতে বিপন্ন জীবন — প্রায় সবটাই ধারণ করেছে উপন্যাসটি, সাথে আছে ক্রমাগত শোষিত সেই দেশে একজন নিম্নবর্ণের মানুষ ও তার জীবন-ইতিহাস যা উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষের সংকটকেই প্রতীকায়িত করে। বিভাজনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির, একটি দেশের সামগ্রিক পরিণতি হয়ে ওঠে ব্যাপ্ত, জাতির ইতিহাস নির্মাণে ও বিশ্লেষণে *মহাভারত-রামায়ণ* কিংবা *ইলিয়াড-ওডেসির* মতোই এর ভেতরকার আয়তন। একজন যোগেন মণ্ডল ও একটি ভারতবর্ষকে সাবয়ব করতে দেবেশ রায়ের এ উপন্যাসে ইতিহাস এসেছে জরুরি অনুষঙ্গ হয়ে; কিন্তু এটি হয়ে উঠেছে ইতিহাস-অতিক্রান্ত বা বিপরীতের এক গভীর জীবনসত্যের ন্যারেটিভ। ইতিহাস-সৃষ্ট আদর্শিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক 'বৈধতাপ্রাপ্ত জ্ঞান' (Idilogical or institutional form of knowledge) তথা 'মেটান্যারেটিভে'র বিশ্লেষণও করেছেন দেবেশ; যেমন — ভারতের 'জাতীয়তাবাদ' বিষয়ক তত্ত্ব-চিন্তা। যে তত্ত্ব একজন যোগেন মণ্ডলের স্বদেশ অন্বেষণের সূত্রে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রেণি-সংগ্রামী, স্বদেশ-অন্বেষী একজন সাধারণ মানুষের দেশ হারানোর এ গল্পটি তাই ইতিহাস ও সময়ের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ হয়ে ওঠে।

যোগেন মণ্ডল, যে বর্ণহিন্দুর উচ্চতা অস্বীকার করতে তার জন্মের নীচতা স্বীকার করেছেন, 'শূদ্র হিন্দু নয়; সে স্বতন্ত্র' — শূদ্রের এ স্বাধিকারের যে গর্বিত ব্যবহার করেছে; উপন্যাসের শেষেও সেই যোগেনের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জবাবহীন থাকে, সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কিত চর্চিত ও অনড় বোধে, অবরুদ্ধ জাত-পাতে, অনিবার্য হয়ে ওঠা দেশ বিভাজনে, বিখণ্ডিত স্বদেশ চিন্তায়। যোগেন শেষপর্যন্ত তার শূদ্রত্বের পরিচয়কেই একমাত্র করে তোলেন:

> চাইলেই কি আর বামুন হওয়া যায়? বামুন হয়ে জন্মাতে হয়। তেমনি গান্ধীজী আর সেনসাস চাইলেই কি শূদ্র হয়ে যায় হিন্দু। শূদ্র হয়ে জন্মাতে হয়। একমাত্র তাহলেই পাওয়া যায় শূদ্রের এই স্বাধীনতা, আমি স্বাধীন শূদ্র। (দেবেশ, ২০১০: ১০৫৯)

স্বদেশ-কাঠামো থেকে উদ্বাস্তু, ইতিহাসিত মানব যোগেন ইতিহাসের বিপরীতে তাঁর পথ আর একবার চাক্ষুষ করতে চান — 'সেই পথ, তার বিদ্রোহের, আর্য প্রবেশের ও এখন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার। যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার-হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র। চলেছে পাকিস্তানে।' (দেবেশ, ২০১০: ১০৫৯) যোগেনের স্বদেশ, যে দেশ এক ডিনায়াল পলিসি-তে আক্রান্ত, সেই 'বেকবুল (ডিনায়েড) দেশে'র জনহীন জলভুবনে বহু পথ হেঁটে সে দেখল, 'সেখানে মানব সম্পর্কোচিত সমস্ত সম্বোধন লোপাট। সেই জলপ্রান্তরে যাতায়াতের কোনো পথও নেই,... সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ ফেলা আইনত নিষিদ্ধ।' (দেবেশ, ২০১০: ৯৭৯) বিভাজিত দেশে বিতাড়িত অস্পৃশ্য যোগেন স্বদেশকে হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে অনুভব করেন:

> এই বিপুল জলদেশ মহাদেশ স্রোতোদেশ ঘূর্ণিদেশ, নৌদেশ মেঘদেশকে কতটাই শিক্ষিত নিশ্চয়তায় চিহ্নহীন করে দেয়া হল। এমন শিক্ষিত নিশ্চয়তা থাকে শুধু তেমন কল্পনাক্ষমদের যারা এক কল্প পরিমাণ সময় দেখে ফেলতে পারে সেই সময়ের সূচনার আগে।... যারা নিজেরও অজ্ঞাতে ইতিহাসের বাহক। যারা অনেক অতীত থেকে স্থির মানব বসতিকে অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারে... ইতিহাসকে ধ্বংসচিহ্নহীন, ক্ষতহীন, আদিম ও নৈসর্গিক করে দিতে পারে। (দেবেশ, ২০১০: ৯৮১)

আধিপত্যের কাঠামোর কাছে পরাজয়, বহিষ্কারের বোধই জন্ম দেয় অন্তর্ঘাতের রাজনীতি ও ইতিহাসের, অন্তর্ঘাতের ভাষার, সর্বোপরি অন্তর্ঘাতের নন্দনতত্ত্বের। ধ্যানে অখণ্ড বাংলা, অখণ্ড ভারতবর্ষ তথা দেশ-মাতৃকার এক অপরূপ মহাকাব্য-গাথা নিয়েই যোগেনের উদ্বাস্তু হওয়া, সেটা তার কোনো নব অর্জনের নয়, বরং পরম একাকিত্ব আর চিরতরের স্বদেশহীনতারই যাত্রা। দেবেশের মতে, 'শূদ্র ছাড়া সে-দায় আর কে নেবে?' (দেবেশ, ২০১০: ১০৫৯) দেশ বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত যোগেন মণ্ডলের সংগ্রাম ও একাকিত্ব ভারতবর্ষের আপামর জনমানুষের সংগ্রাম হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু বা দেশ হারানো সকল মানুষের ইতিবৃত্ত।

গ.

দেশবিভাজনের সাহিত্যকর্মে বিষয়-প্রবণতার দিক থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ছবি ও পরোক্ষ প্রভাব, বাস্তুহারাদের অসহনীয় উন্মূলিত জীবন-চিত্রণ এবং ঔপনিবেশিক ও দেশীয় রাজনীতির চরিত্র ব্যাখ্যানে দেশবিভাজনের বেদনার কথাই অধিক লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ সাহিত্যিক প্রয়াসে উদ্বাস্তু মানুষের ট্র্যাজেডিই প্রধানত চিহ্নিত হয়েছে। কখনো কখনো এ সাহিত্যকীর্তি ইতিহাসের বিকল্প বয়ান

হয়ে ওঠে। লুপ্ত ইতিহাস অথবা ইতিহাসিত সময়ের এসব ভাষ্য সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সময়প্রবাহের ইতিবৃত্ত এবং সামগ্রিক জীবনানুসন্ধানী শিল্পকর্মে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> 'হাই-পলিটিক্সের' বিপ্রতীপে দেশজোড়া আখ্যানে পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান জনজীবনের সন্নিকর্ষতা অথবা এই দুই বিপরীত মেরুর পরিচিতি-সত্তার পরস্পর-সাপেক্ষ জীবনচর্যার বিচিত্র স্মারকগুলি। দেশভাগের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর জুড়ে দেশভাগের কারণ ও রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চলেছে; পরবর্তীতে এই চৈতন্য-আলোড়নকারী ঘটনাবলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়ার অন্য ধারাটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নীচুতলার মানুষের সামাজিক নির্ভরশীলতার জীবন দলিলীকৃত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান প্রবণতাকে উশ্‌কে দিয়ে এই সাহিত্য আসলে অন্তর্ঘাত ঘটায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বোঝাপড়ার কল্পটিতে। সেই মর্মন্তুদ স্মৃতির পুনরুদ্ধার সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠলে উদ্বাস্তু জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বৈধতা পায়; রাজনৈতিক কূটতর্কের বিকল্প বয়ান নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যের প্রস্তাবনা করে। (মননকুমার, ২০১৪: ১৬)

সুতরাং, কেবল সময়ের দলিলীকরণেই দেশভাগকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল সার্থকতা নয়। কখনো কখনো সাহিত্যিকের 'ন্যারেটিভ' বিভাজনের রাষ্ট্রীয় সীমানাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে; এছাড়া ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে; ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বীয় জিজ্ঞাসার আধার হয়ে ওঠে। তবে এই সবকিছু অতিক্রম করে সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট হয়েছে বিভাজনের ফলে ভেঙে যাওয়া এক সময়; নিরস্তিত্ব, বিপর্যস্ত ও স্খলিত মানবতার আক্ষেপ এবং নিরন্তর জীবনের সৃজনশীল বয়ান। শিল্পীর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দেশভাগের সামগ্রিক বিপর্যাস তুলে ধরে দেশভাগের কথনবিশ্ব একইসাথে ব্যক্তি ও সামষ্টিক মানুষের শিল্পিত ইতিহাস হয়ে ওঠে; পরিণত হয় সময়-অতিক্রমী শিল্পভাষ্যে।

টীকা

১. প্রশান্ত ভরদ্বাজ, অসীম খাজা ও আতিফ মিয়া 'Economic & Political Weekly' [ISSN (Online) -2349-8846] নামক গবেষণা পত্রিকায় 'The big march: migratory flows after the partition of India' প্রবন্ধে লেখেন:

> We estimate total migratory flows of 14.5 milion and outflows of 17.9 milion, implying 3.4 milion 'missing' people. Flows were much larger along the western border, higher in cities and areas close to the border, and dependent heavily on the size of the 'minority' religious group. The migratory flows also display a "relative replacement effect" with in-migrants moving to places that saw grater outmigration. (Bharadjwaj

Prashant, Asim Khwaja and Atif Mian, 'Economi and political Weekly', August 30, 2008 : 39-49)

২. ১৯৩২ সালে বেঙ্গল সরকার হিন্দু সমাজের মধ্যে সবচেয়ে নীচু শ্রেণির লোক অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতিকে বোঝাতে 'তফশিলি সম্প্রদায়' প্রতিশব্দটির ব্যবহার করেন। (বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : S. K. Gupta রচিত গ্রন্থ *The Scheduled Castes in Modern Indian Politics : The Emergence as a Political Power*, 1985.)

সহায়কপঞ্জি

খুশবন্ত সিং, ১৯৯৬। *ট্রেন টু পাকিস্তান* (আবু জাফর অনূদিত), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী, ২০০৩। *বাংলা ভাগ হল/হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)* [আবু জাফর অনূদিত], দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

দেবেশ রায়, ২০১০। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২০১৪। 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে', *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি* (সম্পা. মননকুমার মণ্ডল), গাঙচিল, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৪২১। 'যোগেন মণ্ডলের একাকীত্ব', *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পা. স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা।

মননকুমার মণ্ডল (সম্পা.), ২০১৪। *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি*, গাঙচিল, কলকাতা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ২০০৭। *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ/ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, কথামেলা, ঢাকা।

Dwaipayan Sen, 2018. *The Decline of the Caste Question: Jogendranath Mandal and the Defeat of dalit Politics in Bengal*, Cambridge University Press, US.

Saros Cowasjee, 1982. *The Partition in Indo-English Fiction: Exploration in Modern Indo-English Fiction*, R. K. Dewan (ed.), Bharati publications pvt. ltd., New Delhi.